এক বৃষ্টি ভেজা রাতে

মনজিলুর রহমান

কান্নার শব্দটা আসছিল বড় ভাবীর ঘরের ওদিক থেকে । পরিস্কার মেয়েলী কন্ঠের কান্না । গভীর কষ্টে বুকের অনেক ভেতর থেকে উঠে আসা কান্না। এত রাতে এ বাড়ি কাঁদবে কে ? ভাবীর বাপের বাড়িতে কোন দুঃসংবাদ ? তাই ভাবী কাঁদছে । না , তাহলে তো দিনের বেলায় শোনতাম !

বেশ একটা কৌতুহলী ভাবনায় পড়ে গেলাম ।

জয়গাছি চেয়ারম্যান বাড়ি । আমার ফুফু বাড়ি । আমার ফুপা সফদার তালুকদার আমরণ এই এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। আমি যখন ক্লাশ এইটে পড়ি সেবার তিনি মারা গিয়েছেন। এলাকায় তার যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি ছিল । এখনও এ বাড়িটি চেয়ারম্যান বাড়ি বলে পরিচিত । আমার বাপ চাচারা চার ভাই বোন । আমার বাবা সবার বড় তার পর আমার এ ফুফু । এর পরে রয়েছে আমার মেজো ও ছোট চাচা । মেজো চাচা থাকেন রাজশাহী , তিনি বাংলাদেশ রেলওয়েতে বড় অফিসার ছিলেন রিটায়ার্ট হবার পরে রাজশাহীতে সেটেল হয়েছেন সেখানে স্বপরিবারে থাকেন আর ছোট চাচা থাকেন সৈয়দপুরে । তিনিও রেলওয়েতে চাকুরী করছেন। আমরা থাকি গ্রামের বাড়ি টেংরাখালী । আমার ফুফুর দুই ছেলে তিন মেয়ে । বড় ছেলে , মানে শাকিল ভাই আর্মি অফিসার । জাতিসংঘের আহবানে আর্ন্তজাতিক বাহিনীর সাথে তিনি আছেন আফ্রিকার লাইবেরিয়ায় । শামীম ছোট ছেলে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার , স্বস্ত্রীক থাকেন সেখানে । আর তিন ফুফাত বোন তাদের বিয়ে শাদী হয়ে গেছে । তারা সবাই আমার বড় । একমাত্র ছোট পারুল । তারও বিয়ে হলো বছর খানেক আগে । যে যার মত স্বামী সংসার নিয়ে ভালই আছে । দু'টো দোতালা ঘরসহ চার পাঁচটে ঘর নিয়ে গ্রামের এই বিশাল বাড়িটায় একা থাকেন আমার ফুফু । একা ঠিক নয় । পৌত্র , পূত্র বধূ ও চার পাচঁজন কাজের লোক রয়েছে তার সাথে । পশ্চিম পাশের দোতালা ঘরটায় বড় ভাবী অর্থাৎ শাকিলের স্ত্রী তার আঠার মাসের এক ছেলে নিয়ে থাকেন। ঠিক অপর দিকের দোতালায় আমি আর ফুফু । আমি স্কুল মাধ্যমিক পাশ করার পরে যখন কলেজে ভর্তি হব ঠিক তখন ফুফু যেয়ে আমার নাম নিয়ে বাবাকে বলল , সে এখন কলেজে পড়বে বাড়ির পাশের কচুয়া কলেজে ভর্তি না করায়ে ওকে নিয়ে আমি বাগেরহাট পি সি কলেজে ভর্তি করে দেই । আমার বাড়িতে আপনজন বলতে তো কেউ নেই ওয়ি থাকবে আমার পাশে । সেই থেকে আমি ফুফুর কেয়ার টেকার প্লাস লজিং মাষ্টার । ছোট কোন ফুফাত ভাই বোন নাই যে তাদের পড়াতে হয় । পাড়ার স্কুলগামী ছেলেমেয়েরা আসে মাঝে মধ্যে তাদের নিয়ে বসি । কেউ কোন পয়সাকড়ি দেয় না । অবৈতনিক টিউটর । বেশ ভালই আছি ফুফু বাড়ি । খাই- দাই কলেজ করি । বাবার শাসন আর মায়ের বকুনী এখানে অনুপস্থিত । ফুফু আমায় ভীষন আদর করেন। আমার চেহারার নাকি

তিনি দাদার চেহারার ছাপ দেখতে পান । তাই তিনি আমায় ডাকেন বা'জান। আমার কলেজের বেতন, বই - পুস্তক ,পকেট খরচ সবই বহন করেন ফুফু । বাবার কাছে পয়সা চাইলে উল্টো ধমক দেন তিনি।

ফুফুর বয়স ষাট সত্তরের কাছাকাছি । এই বৃদ্ধা বয়সে উপর নীচ ওঠা নামা করতে কষ্ট হয় । তাই তিনি নীচ তলায় তার এক ননদকে সাথে নিয়ে থাকেন । আমার থাকার রুমটি হয়েছে দোতালায় । ফুফুর ননদ ফুফু সেই মহিলা তিনিও বয়স্কা এবং বিধবা । ছেলেপেলে সব বড় হয়ে গেছে সংসারে কোন ঝুট-ঝামেলা নেই । বছরের অধিকাংশ সময়ই এখানে থাকেন। মেয়েরা যতই ঘর সংসার করুক না কেন বাপের বাড়ি থাকতে সবাই ভালবাসে । ফুফুও তাকে ভীষন পছন্দ করেন । ননদ - ভাবী মিলে বেশ আছেন । এক মহিলা আছে ঘরদোর গোছানো রান্না বান্না করেন। ফুফু আর শাকিল ভাইয়ের ছেলে দুধ খায় । বাজারে ভেজাল ছাড়া ভাল দুধ পাওয়া যায় না । তাই শাকিল ভাই বড় বড় দু'টো সিন্ধি গাই কিনে দিয়েছেন তাদের জন্য । এ গাই দু'টো দেখা শোনা করার জন্য আবুল হাসেম নামের এক ছেলে আছে । সে প্রায় আমার সমবয়সী । হাসেম আমার খুব ভক্ত । সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থাকতে পছন্দ করে । আমার সব ফাই ফরমায়েজ সে শোনে । আমি তাকে হাসু বলে ডাকি আর সে আমায় ডাকে মাষ্টার 'দা । তার কণ্ঠস্বর ভারী চমৎকার । বিকেলবেলা গরু চড়াতে মাঠে গেলে উদাস কন্ঠে গান গায় । মাঝে মাঝে আমাকেও গেয়ে শোনায় । " পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায়ে আমি রই , আমি তো সে ঘরের মালিক নই ।" গানটি সে ভারী দরদ দিয়ে গায় । গানটি যখন গায় তখন তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে ।

আরেক জন লোক আছে ফুপার দুর সম্পর্কের চাচাত ভাই । একটু হুজুর টাইপের লোক । বাড়ির পাশের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ান আর বাজারঘাট থেকে শুরু করে সব কিছু দেখা শোনা করেন । খুবই তীক্ষ্ম চোখের মানুষ । তার চোখ ফাঁকি দিয়ে এই বাড়িতে একটি কুটোও কেউ এদিক ওদিক করতে পারে না । ফুফু তাকে ডাকে বাজার সরকার , আর আমি মুনশী কাকা । শামীম ভাই চেয়েছিলেন ফুফু বরিশাল গিয়ে তার সাথে থাকুন। তিনি গেলেন না। স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও তিনি থাকতে রাজি না।

কিছুদিন হলো আরেকটি যুবতী মেয়ে এসে জুটেছে এ বাড়িতে । বড় ভাবীর বাপের দেশের মেয়ে । ভাবী ছেলেটাকে নিয়ে সামলিয়ে উঠতে পারে না। তাই তার মা পাঠিয়েছে মেয়েটাকে । ভাবীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে সে ফুফুকেও বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে , তার সাথে গল্প করে । ফলে মেয়েটিকে ফুফুও পছন্দ করতে শুরু করেছে ।

মেয়েটির নাম মুনিয়া । এ বাড়িতে আসার পর তাকে আমি কয়েকবার দেখেছি । নিঃসংকোচে এদিক ওদিক ছুটছে । মুনিয়া পাখির নামে নাম । তার চাল চলনও পাখির মত । সে যেন হাঁটে না , উড়ে উড়ে চলে । এই এখানে দেখছি পরক্ষণে দেখছি আরেক খানে । এক্ষনই দেখলাম ভাবীর ছেলেটার ময়লা প্যান্ট নিয়ে পুকুরে গেল পরক্ষনে দেখছি ফুফুর সাথে বসে গল্প করছে । ভারী মিষ্টি মেয়ে ।

একদিন দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসু আর আমি গল্প করছি । এমন সময় দেখলাম মেয়েটি কলসি কাঁখে জল নিয়ে ভাবীর ঘরে ঢুকছে । কলসি কাঁখে মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে যখন হাঁটছে দারুণ লাগছে তাকে । হাসুকে জিজ্ঞেস করলাম , সুন্দরী মেয়েটি কে রে ?

আমার মুখে এমন কথা শুনে হাসু কেমন যেন লজ্জা পেল । গম্ভীর গলায় বলল , ভাবী তো ছেলেটাকে নিয়ে একা একা সামলাতে পারে না, তাই তার মা মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন ভাবীর সাহায্যের জন্যে ।

হাসুর গলার স্বরটা শুনে বিষয়টা আমার যেন কেমন কেমন মনে হলো । সে কি মেয়েটার প্রতি দূর্বল ! নাকি অন্য কিছু ?

তাই কথাটা আর বাড়ালাম না।

চৈত্র মাস । কাঠ ফাটা রৌদ্দুর । মাঠ-ঘাঠ ফেটে চৌচির । ক'দিন ধরে আকাশে মেঘ জমে , কিন্তু বৃষ্টি হয় না । গরমে মানুষজন অস্থির । আজও আকাশে বেশ মেঘ জমেছে । কলেজ থেকে ফিরে ঘাড়ে লুঙ্গি গামছা ও নারকেলের খৈল আর ভাত ভর্তি একটা গামলা নিয়ে পুকুর পাড়ে গেলাম । পুকুর তো না যেন পদ্ম দিঘি । সান বাধাঁনো ঘাট আর চার পাড়ে নানান রকম ফলফুলের গাছপালা । ঘাটলার পাশেই এক ঝাড় রক্তজবা ফুলের গাছ । অনেক জবা ফুটেছে তাতে ফুলের ভারে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে পুকুরে । রুই ,কাতলা, মৃগেলসহ নানান জাতের পোষা মাছে পুকুর ভর্তি । কলেজ থেকে ফিরে গোসল করার আগে মাছগুলোকে খাবার দেওয়া আমার একটা রুটিন মাফিক অভ্যাস। আর মাছগুলোও ঠিক এ সময়ে ঘাটে এসে আমার প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে। খাবারগুলো ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছি ঝাঁকে ঝাঁকে মাছেরা এসে মনের আনন্দে খাচ্ছে আর পাখনা মেলে সাঁতার কাটছে । প্রতিদিন এ দৃশ্য আমার কাছে খুবই ভালো লাগে । এমন সময় জবা গাছের ঐদিক থেকে এক ঝাঁক রাঁজহাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরে আর মাছগুলো সব পালিয়ে গেল ।

বাগানের পূর্বদিক থেকে ভেসে আসছে হাসুর গানের সুর , " দোল দোল দোলনি রাঙা মাথার চিরুনী , এনে দেব হাট থেকে মান তুমি কর না ।" আমি তাকে ডেকে বললাম,

হাসু , ও হাসু তোর মনে যে রঙ লেগেছে । কার জন্যে রাঙা মাথার চিরুনী কিনছিস ।

মুনিয়া এ বাড়িতে আসার পর হাসুর চালচলনে বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে । আগে সে মারফতি , মুর্শিদী গান গেত । আর এখন সে প্রায়ই প্রেমের গান গায় ।

না , না মাষ্টার দা এমনি গাইছিলাম । কার জন্যে আবার কিনব , আমার কে আছে ? যে তার জন্যে কিনব । মাষ্টার দা আপনি কলেজ থেকে ফিরেছেন ? আমি সেই কখন থেকে আপনার প্রতীক্ষায় আছি । একটা মজার খবর আছে ।

ঠিক আছে । তুই এদিকে আয় কথা হবে । দেখতো গাছ থেকে ডাব পাড়তে পারিস কিনা। গরমে বুকটা শুকিয়ে গেছে একটা ডাব খেতে পারলে ভাল হতো । গোটা চারেক ডাব নিয়ে হাসু উপস্থিত হলো ।

দুইজনে ডাব খাচ্ছি । আর গল্প করছি ।

হাসু বলল মাষ্টার দা , আজ সন্ধ্যার পরে হিন্দু পাড়ায় গাজী কালুর পালা গান হবে । আমি যাব ,বড় ভাবীর সাথে কথা হয়েছে সেও যাবে । তুমি যাবে আমাদের সাথে ?

মুনিয়া ! সেও যাবে ?

ধ্যাৎ , মাষ্টার দা । তুমি শুধু মুনিয়া মুনিয়া কর । আমি কি মাইয়াডারে ইয়ে মানে ভালপাই নাকি ?

তা না হলে এত রঙ কিসের ? সারাদিন গুণ গুণিয়ে রসের গান ! ঘন ঘন বড় ভাবীর ঘরে আসা যাওয়া , তারে পটায়ে গান শোনতে নেওয়া । সে গেলে তো আর একা যাবে না । সাথে তো মুনিয়াকে যেতেই হবে । ঘটনাটা কি ?

মাষ্টার দা - - - -?

সে যেন আরো কিছু বলতে চেয়েছিল । এমন সময় ঐ দিকে ফুফুর গলা , ও বা'জান , তুই কি সারাদিন মাছের খেলা দেখবি ? কলেজ থেকে ফিরেছিস সেই কখন, খাবি না । গোসল করে তাড়াতাড়ি আয় ।

আমি আসছি ফুফু মা।

বিকেল থেকে আকাশের মেঘগুলো যেন আজকে বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে । রেডিওতে খবর দিয়েছে দমকা হাওয়াসহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে ।

সন্ধ্যার পর পরই হাসু এসে বলল, চলেন যাই ।

আকাশের অবস্থাটা বেশী ভাল মনে হচ্ছে না । ঝড়-বৃষ্টি আসতে পারে এ অবস্থায় যাবি ?

এ রকম আজ পনের দিন থেকে দেখা যাচ্ছে । বৃষ্টি বাদল তো হচ্ছে না , আজও হবে না , চলেন যাই । ওদিকে ভাবীদের রেডি হতে বলে এসেছি ।

তা হলে যাবি ?

হ্যাঁ।

চল ।

যেয়ে দেখি বাড়ির উঠানে সামিয়ানা টানায়ে মাঝখানে দু'টো জলচৌকি জোড়া দিয়ে মঞ্চ তৈরী করেছে । হিন্দু মুসলমান অনেক মানুষের সমাগম । চারিদিকে শিশু কিশোরদের হৈ চৈ ছুটাছুটি । জারী-শাড়ি ,যাত্রা -পালা , কবি-কিচ্ছা গ্রামের মানুষের কাছে আজও জনপ্রিয়

বিশেষ করে বয়স্কদের কাছে। শহরের বড় পর্দায় যারা সিনেমা বায়স্কোপ দেখার সুযোগ পায় না তারা এসব দারুণভাবে উপভোগ করে।

মনে হলো অল্প কিছুকক্ষণের মধ্যেই পালা শুরু হবে। আয়োজক কর্মীদের দেখা গেল মহাব্যস্ত। দু'জনকে দেখলাম হ্যাজাক লাইটগুলো মাঝে মাঝে পরখ করে দেখছে তা ঠিক ঠাক আছে কি না ? যাতে মূল অনুষ্ঠানের সময় কোন বিঘ্ন না ঘটে। নারী পুরুষদের পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাদের আসন গ্রহন করার জন্য বার বার মাইক্রোফোনে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। আসন বলতে খড় বিচালীর উপর হোগলা পাতার চাটাই। কোন চেয়ার-টেয়ার নেই। অনেকে আবার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছোট ছোট মাদুর বা চাটাই নিয়ে এসেছে। আমাদের হাসু মিয়াও কয়েকটা ছোট ছোট মাদুর নিয়ে গেছে। সেখান থেকে একটা বের করে আমার জন্য আসন পেতে বসতে বলে দ্রুত চলে গেল ভাবী ও মুনিয়ার দিকে। যেহেতু সে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে আমাদের মেহমানদারি করাও যেন তারই দায়িত্ব। উঠানের আশ পাশে ছোট খাট কয়েকটা পান বিড়ির দোকানও বসেছে। হাসু সেখান থেকে মসলাওয়ালা দু'টো পান কিনে ভাবীকে দিল। আমি পান বিড়ি খাই না সে জানে, তবুও একবার জিজ্ঞেস করল, আমি পান খাব কি না ? ভাবীর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে মুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাসুকে দেখলাম মুনিয়ার কোল থেকে ছেলেটাকে একবার নিয়ে তার সাথে ভাব জমাতে চেষ্টা করছে।

রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে মঞ্চের পর্দা আস্তে আস্তে সরতে লাগল। বাইরের কোলাহলও সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এলো। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এক সুদর্শন যুবক। মঞ্চের একেবারে সামনে এসে,

শুভ সন্ধ্যা সুধী দর্শকমন্ডলী। এতক্ষণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতায় আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মঞ্চায়ন করতে যাচ্ছি ঐতিহাসিক রূপকথার লোকগাথা গাজী কালুর অন্তরগত শাহজাদা জামাল ও শাহজাদী কমলা সুন্দরীর প্রেম বিরহের জীবনালেখ্য " কমলার বনবাস।" মূল অনুষ্ঠানে যাবার পূর্বে এখনই পরিবেশিত হবে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। সঙ্গীতের সম্মানার্থে আশাকরি এসময়ে আপনারা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করবেন। ধন্যাবাদ।

জাতীয় সঙ্গীত শেষ হতে না হতেই উত্তর আকাশ ভেঙ্গে শুরু হলো ঝড়ো হাওয়া সঙ্গে শীলা বৃষ্টি। বাতাসের তোড়ে ধূলা বালি এসে নাক মুখে লাগতে লাগল। ফৎ ফৎ করে সামিয়ানাটা উড়তে লাগল। পন্ড হয়ে গেল যাত্রা পালা। লোকজন বিভিন্ন ঘরে আশ্রয় নিল। অনেকে সেই ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা যে যার বাড়ির দিকে ছুটল। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমরাও ছুটলাম আমাদের বাড়ি। এত দিনের গুমোট গরমে পৃথিবী যেন শীতল হয়ে আসল। বাড়িতে যখন ফিরলাম দেখি ফুফু তখনও ঘুমাননি। তিনি বললেন, হয়েছে তোমার গান শোনা ! ঠিক আছে এখন হাত মুখ মুছে শুয়ে পড়। সকালে কলেজ আছে।
ভজা কাপড়গুলো পাল্টায়ে হাত মুখ মুছে একটা চেয়ার টেনে দোতালার বেলকোনিতে বসে গভীর ভাবে বৃষ্টি দেখছি। বৃষ্টি নিয়ে কত সৃষ্টি, কত গান কত কাব্য। আমি যদিও কোন কবি সাহিত্যিক নই, তবুও তো আমার একটা মন আছে। তাকে একটু উপভোগ না করে শুতে যাই কি করে ?

হয়তো এমনই এক পরিবেশে রবি ঠাকুর লিখে ছিলেন, " এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়।" আমারও যে মনে পড়ছে সেই মেয়েটিকে, কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি বারান্দার উত্তর দিক থেকে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছি ঠিক সেই মূহুর্তে আরেকটি মেয়েও হেঁটে আসছিল অপরদিক থেকে বারান্দার শেষ মাথায় মোড় নিতেই দু'জনে মুখোমুখি ধাক্কা লাগার উপক্রম। দু'জনেই সরি বলে চলে গেলাম দু'দিকে। পরে একদিন দেখলাম সে আমারই ইয়ারমেড। এর পরে তার সাথে দেখা হলেই লজ্জা রাঙা মুখে অন্যদিকে তাঁকায়। আমিও তার মুখের দিকে তাকাতে লজ্জা পাই। অনেক দিন ভেবেছি, আরেকবার দেখা হলে বলব, সেদিনের ঐ ঘটনার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। দেখা অনেকবারই হয়েছে কিন্তু আজও তা বলতে পারিনি। আজকের এই বৃষ্টি বাদলের দিনে সেও কি এমন ভাবছে ? এমনই ভাবতে ভাবতে বৃষ্টির নৈসর্গিক দৃশ্য দেখছি। কখনও ঝড়ের বেগে কখনও আবার রিম ঝিমিয়ে বৃষ্টি আসে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার ঝলকানিতে অনেক দূর দেখা যাচ্ছে। বাঁশঝাড়-গুলো বাতাসের চাপে নুয়ে পড়ছে আবার জেগে উঠছে। এমনি দেখতে দেখতে বৃষ্টি মধুর ঠান্ডা বাতাসে কখন যে চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও টের পাইনি। টের পেলাম তখন যখন একটি মেয়ের কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। হাত ঘড়ির দিকে তাঁকিয়ে দেখি রাত দু'টো। এত রাতে এ বাড়ি কে কাঁদে। তাও মেয়েলী কন্ঠ। আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম। শব্দটা ভাবীর ঘরের ওদিক থেকে আসছিল।

একি ভাবী ; না মুনিয়া ! ভাবীর বাপের বাড়িতে কোন অঘটন ঘটেছে ? তাই সে কাঁদছে ! তবে কি মুনিয়া ? না, তারা তো আমাদের সাথে গান শুনতে গিয়েছিল। এমন হলেতো ভাবী যেত না। তা হলে ব্যাপারটা কি ?

তখন অন্য একটা কথা ভেবে গা কাঁটা দিয়ে উঠল। গাঁও গেরামে নাকি রাতে কত সব ভূতুরে কান্ড ঘটে। নিঝুম রাতে ভূত প্রেতরা নাকি নানা রূপ ধরে কেঁদেকেটে গান গেয়ে কিংবা নানা সুরে ডাক দিয়ে একাকী মানুষের মনোযোগ আকর্ষন করে।

আমার বেলায় ও কি আজ তাহলে কি তাই ঘটেছে ? এই নিঝুম রাতে খোলা বারান্দায় একাকী ঘুমিয়ে আছি এই দেখে কি তারা কেঁদে কেঁদে আমায় ডাকছে ? আমার তাহলে এখন কি করা উচিৎ ? ঘরে ঢুকে দরজা বন্দ করে শুয়ে পড়ব ; নাকি বেড়িয়ে দেখে আসব আসল ব্যাপারটা কি ? হাসুকে ডেকে নিব ! দু'জন একসঙ্গে গেলে কি সে আমায় দেখা দেবে ? এসব ক্ষেত্রে শুনেছি যার সঙ্গে দেখা দিতে চায় সে ছাড়া অন্য কেউ গেলে তারা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। অতএব, হাসুকে নেওয়া চলবে না। যেতে হলে একাই যাব।

সঙ্গে সঙ্গে গা ছম ছমে ভাবটা কেতে গেল। বুকের ভেতর জেগে উঠল একজন সাহসী পুরুষ। চেয়ার ছেড়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সন্তর্পণে রুমের দরজা খুলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে ফ্লাস লাইটা হাতে নিলাম। লাইট নিলাম কিন্তু তা জ্বালালাম না। অন্ধোকারে পা টিপে টিপে দোতালা থেকে নিচে নেমে এলাম। হাসু থাকে আমাদের ঘরের নিচ তলার একটি রুমে।দেখলাম তার রুমের দরজা বন্ধ। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্তর্পণে তার রুমটি অতিক্রম করছি যাতে আমার পায়ের শব্দে সে জেগে না উঠে। তা হলে তো ভেস্তে যাবে আমার ভূত দেখার পরিকল্পনা।

বৃষ্টি তখনও থামেনি টিপ টিপিয়ে পড়ছে তবে ছাতা ছাড়া যাওয়া যায়। আস্তে আস্তে বড় ভাবীর ঘরের দিকে এগুচ্ছি। দেখতে পেলাম ভাবীর বারান্দার পশ্চিম দিকে একটা শাড়ী নাড়া। শাড়ীটা মাঝে মাঝে বাতাসে ওড়ছে তারই আড়ালে মেয়ে মানুষের ছায়ার মত একটি ছায়া। মাথার চুল ছাড়া। চুলগুলো কোমর পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে। সামনের দিকে এগুচ্ছি একটু একটু ভয়ও পাচ্ছি। কাছে গেলে আমার সাড়া পেয়ে যদি বড় বড় বড় দাঁত বের করে ভেংচি দিয়ে উড়ে আসে আমার দিকে। ফ্লাস লাইটটা শক্ত করে ডান হাতে ধরে রেখেছি সঙ্গে সঙ্গে লাইট ফ্লাস করে দিব ওর মুখে। আলো নাকি তারা সহ্য করতে পারে না। তারপরে আবার ফ্লাস লাইটের তীর্যক আলো।

এমন সময় আমার পিছন দিক থেকে হাসুর ডাক, " মাষ্টার দা'।" পরিচিত কন্ঠ তবুও কেন যেন অপরিচিত মনে হলো।

ভয়ার্ত ভঙ্গিতে পেছন ফিরেছি, দেখি হাসু। কখন ঘুম ভাঙল তার ! আর কখন এভাবে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে !

সে আস্তে করে আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, এই দিকে আসেন। আমি ভয়ার্ত গলায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাস করলাম ব্যাপারটা কি ?

হাসু পরিস্কার গলায় বলল, কিছুই না। ও যখন কাদঁছে কান্দুক। এই ভাবে কাদঁলে মনের দুঃখ হাল্কা হয়। আমাদের দেখলে লজ্জা পাবে। তাই আপনারে সরায়ে আনলাম, সে যাতে কিছু টের না পায়।

কিন্তু ওটা কে ?

আপনি চেনেন নি ?

না তো ! আমি কি করে চিনব ? আগে কি কোন দিন এসব দেখেছি নাকি ?

হাসু উদাস গলায় বলল, তাই ! সে যে মাঝে মাঝে এভাবে কাঁদে আপনি তা কোদিন টের পান নাই। আপনি ভাবছেন ভূত প্রেত ! না, সে তা নয়। ও আমাদের মুনিয়া।

মুনিয়া ! মানে ভাবীর ঘরে যে মেয়েটা থাকে ?

হ্যাঁ।

এইভাবে নিশীত রাতে কাঁদছে কেন ?

হাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ঘটনাটা বড়ই দুঃখের। এই বৃষ্টিতে ভেজায় কাজ নেই। চলেন উপরে যাই।

একটা বদমায়েশের সাথে বিয়ে হয়েছিল মুনিয়ার। মুনিয়ার বাপ গরিব মানুষ। নিজের দুই বিঘা জমি আর গোটা চারেক হালের বলদ দিয়ে নিজের ও অপরের জমি বর্গা চাষ করে। একেবারে স্বচ্ছল না হলেও অস্বচ্ছল পরিবার নয়, সংসার মোটামুটি চলে যায়। মুনিয়ারা পাঁচ ভাই বোন। সে সবার বড়। সংসারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি একমাত্র তার বাবা। মুনিয়া যখন ক্লাশ ফাইভ থেকে সিক্সে ওঠে তখন তার বাবা অনেক টাকা খরচ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। জামাইকে নগদ কিছু টাকা-পয়সাও দেয়। বিয়ের খরচ পোষাতে দু'টো হালের বলদও বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। বছর না ঘুরতেই মুনিয়া এক ছেলে সন্তানের মা হয়ে যায়। বদমায়েশ জামাইটা সময় অসময়ে বিভিন্ন অজুহাতে মুনিয়ার বাপের কাছ থেকে টাকা আনতে চাপ দেয়। টাকা না আনলে তার সাথে ঝগড়াঝাটি করে। মাঝে মধ্যে শারিরীক নির্যাতনও করে। একবার আঘাতের চোটে বাম হাতের একটা আঙুল ভেঙে যায়। বিনা চিকিৎসায় আঙুলটি ভাল হলেও বাঁকা হয়ে আছে চিরদিনের জন্য।

গেল মাস তিনেক আগে জামাই একটা রঙিন টিভি কেনার জন্য মুনিয়াকে তার বাবার কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা আনতে বলে। বাপের কাছে সে টাকা চাইতে অপারগ হলে প্রায়ই তাকে শারিরীকভাবে নির্যাতন করে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একদিন ছেলেটাকে নিয়ে বাপের বাড়ি পালায়ে আসে। জামাই তার সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে এসে মুনিয়ার কোল থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেছে।

কি রে বেআদব ছেলেরে !

শুধু বেআদব নয় , মাষ্টার দা '। ডেন্জারাসও। টিভি কেনার ত্রিশ হাজার টাকা না নিয়ে গেলে তাকে তালাক দিবে এবং মুখে এসিড মেরে ঝলসায়ে দিবে বলে হুমকিও দিয়েছে। বাপের বাড়ি থাকা নিরাপদ নয় ভেবে সে এ বাড়িতে পালায়ে এসেছে। একদিকে সন্তানের মায়া ও অন্যদিকে নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে সে মাঝে মাঝে এমন করে রাত বিরাতে কাঁদে।

হাসুর কথা শুনে আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

আমি ভাবছি কি আর শুনছি কি ? কি দূভার্গ্য নিয়ে জন্মেছে আমাদের মুনিয়ারা। দুর্বৃত্তরা তাদের মেড়ে হাড়গুড়ো করে দিচ্ছে , যৌতুকের লোভে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে বাড়ি থেকে , কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে কোলের সন্তান , মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে এসিডে কিন্তু মুনিয়াদের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। থাকলে এভাবে পার পেত না দুর্বৃত্তরা। রাত দুপুরে মনের দুঃখে কাঁদত না আমাদের মুনিয়ারা।

তোর তো মেয়েটাকে ভাল লাগে, তাই না ? তা হলে এক কাজ কর তুই তাকে বিয়ে করে ফেল। আমার কথা শুনে সে হো হো করে হেসে উঠল।

কিরে হাসলি যে ?

আরে মাষ্টার দা ! আমার ঘর নাই , বাড়ি নাই। পরের বাড়ি কাজ না করলে এক বেলা খাবার জোটে না। এ পরিস্থিতিতে পরের একটা মেয়ের দায়িত্ব নিব কোন সাহসে।

সে সাহস আমি জোগাব। কেন তুই কাজ করবি বাহিরে আর সে কাজ করবে অন্দরে। যদি রাজী থাকিস তো ফুফুরে বলে তোদের এ বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিব। তাছাড়া তুই তো মেয়েটাকে ভালবাসিস।

কিন্তু তার তো তালাক হয়নি। সে যে এখনও আরেক জনের স্ত্রী।

ও নিয়ে তুই ভাবিস না। সে দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দে আমি তার একটা সমাধান করে দিব।

ঠিক আছে তুমি যখন বলছ , তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে।

সাব্বাস হাসু , সাব্বাস ! তোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোর মুখ থেকে এমনই একটা কথা আসবে আমি আশা করছিলাম।

আমি নিজেকেও নিজের কাছে ধন্য মনে করলাম যে, নির্যাতিতা একটি অসহায় মেয়েকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারলাম।

তা হলে ঐ কথাই ঠিক থাকল। ফুফুকে বলে একটা শুভ দিনক্ষন দেখে তোদের বিয়ের ব্যবস্থা করব। যা এখন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। ঘুমে আমার চোখও ঢুলু ঢুলু। পরে কথা হবে। শুভ রাত্রি।

আটলান্টা , জর্জিয়া
জুন ১৬, ২০০৮।